দাদাসাহেব ফালকেপ্রাপ্ত সুরকার–সংগীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়াল ১৯৮১ সালের এই দিনে প্রয়াত হন।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন ফুটবলার জর্জ বেস্টের মৃত্যু হয় ২০০৫ সালের এই দিনে।

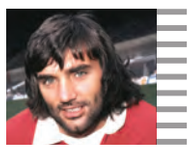

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বৃহস্পতিবার, ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
■ ৪২ বর্ষ ■ ১৮৬ সংখ্যা

কংগ্রেসে ভাঙন ধরিয়ে তেরঙার প্রকৃত দাবিদার হতে চান মমতা

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। অতঃপর ডক্টরেট এবং আড়েবহরে পেল্লায় সরকারি চাকরি। তবু এককথায় সেই চাকরি ছেড়ে বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। বহিরঙ্গে ছোটখাটো। অন্তরে আগুন। মুখ্যমন্ত্রিত্ব পেয়ে শুরু হল জেলা পরিক্রমা। বিভিন্ন জেলায় সশরীরে পৌঁছে বুঝে নিতে চাইলেন, প্রান্তিক মানুষের চলার পথে কাঁটা ঠিক কোথায় কোথায়। আরও একটি কাজ শুরু করলেন। বিভিন্ন মহলের উমেদারি উপেক্ষা করে যাবতীয় সুপারিশ বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ। তবু শেষরক্ষা হল না। প্রফুল্লবাবুর আসন টলে গেল সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে।

প্রফুল্ল ঘোষ শুধু সততা এবং নিষ্ঠা নিয়ে রাজ্য শাসন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শাসন চালাতে প্রয়োজন হয় কূটনৈতিক কৌশলও। আর প্রয়োজন হয় দলের মধ্যে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দাবিয়ে দেওয়া। সেই কাজ দুটি তিনি করে উঠতে পারেননি। অতএব কংগ্রেস দলের অন্দরে বিক্ষুব্ধরা একজোট হলেন এবং তিনি আসন খোয়ালেন। এবার ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে চোখ রাখা যাক রাজীব গান্ধি পর্বে।

প্রফুল্লবাবু যেমন জেলা সফরে বেরিয়েছিলেন, রাজীব সেরকম বেরোলেন দেশ পরিক্রমায়। পশ্চিমবঙ্গে তখন বামেদের রামরাজত্ব। রাজীব গান্ধি এরাজ্যে এসে সামাজিক পরিস্থিতিটা সম্যক বুঝে নিতে চেয়েছিলেন। তিনিও ক্ষমতার দালালদের বিরুদ্ধে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কারও সুপারিশ মানবেন না। এত করেও রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রীর আসনটি ধরে রাখতে পারেননি। কারণ সেই একই। নিকেশ না করতে পারায় দলের অন্দরের শত্রুরাই তাঁর পতন ঘটাল। তাছাড়া কপালে জুটল বফর্স দুর্নীতির তকমা। সেই অভিযোগ প্রমাণ না হলেও ভোটাররা প্রত্যাখ্যান করলেন রাজীবকে।

ধান ভানতে এই শিবের গীত গাওয়ার কারণ একটাই, এরাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতীত এবং ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা। প্রফুল্ল ঘোষ বা রাজীব গান্ধির কর্মপদ্ধতিতে কংগ্রেস ঘরানার ছাপ অতি স্পষ্ট ছিল। জওহরলাল নেহরু যখন স্বাধীনতার আগে এলাহাবাদের বস্তিতে বস্তিতে সাইকেলে ঘুরে বেড়াতেন বা তাঁর কন্যা নিরাপত্তারক্ষীদের বেড়া ডিঙিয়ে মানুষের ভিড়ে মিশে যেতেন বা গরিবি হটাওয়ের স্লোগান দিতেন, তখন তাঁরাও মূলত প্রান্তিক মানুষের সহমর্মী হওয়ার বার্তা ভাসিয়ে দিতে চাইতেন।

সেই বার্তার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ সুপ্ত থাকত না, এমন কথা মোটেও বলা হচ্ছে না। রাজনীতির সোপানে চড়ে যাঁরাই ক্ষমতার আসনে বসতে চাইবেন, তাঁদের সকলের নিজস্ব কৌশল থাকবেই। এতে আশ্চর্যের কী আছে। নরেন্দ্র দামোদর মোদি আবার শ্বেতশ্মশ্রু শোভিত হয়ে মুখে সন্তের ভাব আনতে চেয়েছেন। আধুনিক, আত্মপ্রত্যয়ী, সন্ন্যাসী জাতীয় ভাবমূর্তি গড়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

হিন্দুত্বের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি ভারতের সনাতন সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার বার্তা দেন। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা কায়েম করাই মোদির লক্ষ্য এবং সেটাই তাঁর রাজনৈতিক কৌশল। বিপরীতে সমাজবাদী অর্থনীতির প্রতি কংগ্রেসের দুর্বলতা সুবিদিত। তবে তাদের রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যে আছে মানুষের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস।

বিরোধীরা কংগ্রেসের চালচলনকে ভাঁওতাবাজি বলে কটাক্ষ করে থাকে। তাদের অভিযোগ, কংগ্রেস মানুষের পাশে থাকার নাটক করে। সমালোচনা সত্ত্বেও কংগ্রেস অবশ্য তাদের চলনে পরিবর্তন আনেনি। প্রিয়াংকা বা রাহুল গান্ধির মধ্যেও একই ধারার রাজনীতি দেখা যাচ্ছে। বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বরাবর এভাবে সরকার পরিচালনা করেছেন এবং সাফল্য পেয়েছেন।

তাঁর সৌভাগ্য হল, তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগে ঘরের শত্রুরা বিদেয় হয়েছে এবং এজন্য তাঁকে বিপাকে পড়তে হয়নি। মমতা প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রিত্বের আসনে বসার পর থেকেই নিয়মিত মানুষের দরবারে হাজির হয়েছেন। তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে সেই কাজটি আরও পরিকল্পিতভাবে শুরু করেছেন। গত দু'বার তাঁর পরিচালনায় বড় রকমের ফাঁক ছিল।

তৃতীয়বার ক্ষমতা পেয়ে তিনি প্রশাসন এবং দলের মধ্যে যাবতীয় ফাঁক পূরণ করার জন্য চেষ্টার কসুর রাখছেন না। এর আগে তিনি জনতার দরবারে পৌঁছে মানুষের অভাব–অনুযোগ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলেও সারদা বা নারদ কেলেঙ্কারি আটকাতে পারেননি। স্বভাবতই তাঁর সরকারের ভাবমূর্তিতে কালি ছিটানোর লোকের অভাব হয়নি। দলের সিকি–আধুলি মন্ত্রী, সান্ত্রিদের নিয়ন্ত্রণে সফল না হওয়ায় ঘাসফুল উদ্যানে আগাছার বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। আগাছা সাফ করতে না পারার ফলও ভুগেছেন তিনি।

অন্যদিকে, নখ, দাঁত বার করে বাংলা দখলে নেমেছিল বিজেপি, সংগতে ছিল কখনও সিবিআই, কখনও ইডি। একদিকে দলে ভাঙন, অন্যদিকে দুর্নীতির দায়– দ্বিমুখী এই ফলার সামনে পড়েছিলেন মমতা। তবে মমতা বড় কঠিন ঠাঁই। তাই ভাঙলেন না, মচকালেনও না। কঠিন পরীক্ষায় উতরে গেলেন। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে নিজের আসন ফিরে পেলেও মমতা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, কয়লা, লোহা, পাথর চুরির দাগ মুছে না ফেললে তাঁর দিল্লি চলো ডাক মাঠে মারা যাবে।

তিনি বুঝেছেন, বহু আসনে তৃণমূল এবং বিজেপির ভোট শেয়ারের ব্যবধান সামান্যই। একাধিক আসনে বিজেপি কাঁধের ওপর নিঃশ্বাস ছাড়ছে। তিনি যদি সরকারের ওপর থেকে কালির দাগ না মুছতে পারেন, তাহলে জাতীয়স্তরের নেতৃত্বের প্রশ্নে বিড়ম্বনায় পড়বেন। অতএব যখনই তিনি মাইকের সামনে নতুন প্রকল্প ঘোষণা করছেন, তখনই তাঁকে ক্রমাগত প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিতে হচ্ছে, কোথাও যেন টাকা খাওয়ার কথা না ওঠে।

মমতা জানেন, হাটে–মাঠে–বাজারে এখনও কান পাতলেই শোনা যায়, চুরি–বিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা। রাজ্য সরকারকে প্রায় প্রতিদিন আদালতের রক্তচক্ষুর সামনেও পড়তে হচ্ছে। কখনও বন্যাত্রাণের টাকা নিয়ে কারচুপি, কখনও কর্মী নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে ভারী হচ্ছে বাতাস। স্কুলে কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তে হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এসবের মাঝে রাজ্যে কর্মসংস্থানের রেখচিত্র নিম্নমুখী।

এই কুম্ভীপাক থেকে বেরোতে মমতা এখন অতিরিক্ত সতর্ক। দুর্নীতির কালবৈশাখী রুখে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে না পারলে, বিরোধী জোটে মমতার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। যেনতেনপ্রকারেণ সুশাসন বলবৎ করে কর্মসংস্থানে গতি আনা এখন মমতার প্রধান লক্ষ্য। বীরভূমের দেউচা পাঁচামিতে খনি বা হাওড়ায় শিল্পে বিনিয়োগের স্বপ্ন সফল হলে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে কিঞ্চিৎ স্বস্তি পাবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু জাতীয় নেত্রী হয়ে উঠতে গেলে অন্য রাজ্যেও দলীয় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। সেখানে বাংলার নেতা–কর্মীদের দিয়ে চলবে না। ভিনরাজ্যে পা রাখতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভরসা সেই আদি, অকৃত্রিম কংগ্রেস। তাঁর রাজনীতিতে যে কংগ্রেসি মোড়ক।

অর্থনীতি থেকে মানুষের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনই কংগ্রেসের মতো মমতার ইউএসপি। জাতীয় কংগ্রেসের কাঠামোর সঙ্গেও তৃণমূলের সাযুজ্য লক্ষণীয়। রাহুল যেমন গান্ধি পরিবারের উত্তরাধিকার, তেমনই তৃণমূলের দীপশিখা হয়ে উঠছেন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের অভিষেক। স্বভাবতই মমতার সঙ্গে পথ চলতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন কংগ্রেস কর্মী–সমর্থকরা।

ত্রিপুরায় সুস্মিতা দেব বা গোয়ায় লুইজিনহো ফেলেইরো তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় আস্থা রেখেছেন। সর্বভারতীয় নেত্রী হয়ে উঠতে হলে মমতাকে প্রমাণ করতে হবে, তেরঙা নিশানের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তিনি। জাতীয়স্তরে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে তাঁকে কংগ্রেস শিবিরে ভাঙনের দিকেই তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। সেই কাজটিই তিনি প্রশান্ত কিশোরের সাহায্যে সুচারুভাবে করে ফেলতে চাইছেন।

> একদিকে দলে ভাঙন, অন্যদিকে দুর্নীতির দায়– দ্বিমুখী এই ফলার সামনে পড়েছিলেন মমতা। তবে মমতা বড় কঠিন ঠাঁই। ভাঙলেন না, মচকালেনও না। কঠিন পরীক্ষায় উতরে গেলেন। নিজের আসন ফিরে পেলেও মমতা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, কয়লা, লোহা, পাথর চুরির দাগ মুছে না ফেললে তাঁর দিল্লি চলো ডাক মাঠে মারা যাবে।

সৃজনের বাঁক বদলেও অভিনবত্বে উজ্জ্বল শারদসংখ্যা

মাধবী দাস

শারদোৎসবের সঙ্গে সাহিত্যের হাত দীর্ঘদিনের। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সুলভ সমাচার ১৮৭২–এ 'ছুটির সুলভ' নামে প্রথম শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করে। যদিও পত্রিকার কোথাও 'পূজা সংখ্যা' কথাটি লেখা ছিল না। তবে সময়টি ছিল পুজোর ছুটি। তারপর থেকে 'ভারতবর্ষ', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্রিকা পূজা সংখ্যা প্রকাশ করতে থাকে। সেসময় পত্রিকার প্রচারে লেখা হত, 'দুর্গাপূজার রংতামাশা, পড় দিয়ে একটি পয়সা।'

ক্রমে পূজা সংখ্যা সংক্রামিত হয় মহানগর থেকে জেলা সদর, এমনকি গ্রামেও। জনপ্রিয়তাও বাড়তে থাকে। শারদীয়া সংখ্যাগুলোকে কেন্দ্র করে বাঙালি পাঠক বহু কালোত্তীর্ণ সাহিত্য পেতে থাকেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণাঙ্গ নাটক পরিত্রাণ, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', সমরেশ বসুর আলোড়ন তোলা উপন্যাস 'বিবর', মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা', সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা', ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র মতো বহু কালজয়ী সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ কোনও না কোনও পূজা সংখ্যা।

আজকাল আগের মতো শারদীয়া সংখ্যার কেনাবেচা নেই। স্টলগুলোতে পূজাবার্ষিকী অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকে। দশ বছর আগেও শারদীয়া সংখ্যার জন্য আকুল প্রতীক্ষা থাকত ছোটদের মধ্যেও। 'বাঁটুল দি গ্রেট, 'হাঁদাভোদা' 'নন্টেফন্টে'র মতো কমিকসগুলো বড় আকারের পাওয়ার আশায় আগাম বিভিন্ন পত্রিকায় পুজো সংখ্যার বিজ্ঞাপনের দিকে নজর থাকত তাদের।

পুজোর জামাকাপড়ের মতো পুজো সংখ্যাগুলোর সমান আকর্ষণ ছিল তখন। মণ্ডপের আলোকসজ্জা দর্শনের আগে মনের আলো জ্বলে উঠত নতুন পত্রিকার গন্ধে। নতুন পত্রিকা আর নতুন জামাকাপড়ের গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। মিডিয়া হাউসগুলোর পাশাপাশি লিটল ম্যাগাজিনগুলোও শারদ সংখ্যা বের করে।

ম্যাগাজিন শব্দটির আভিধানিক অর্থ বারুদশালা। বারুদ ঠাসার মতোই সাহিত্যে মশলা পোরার আয়োজন যেন। কবি–সাহিত্যিকদের আঁতুড় এইসব লিটল ম্যাগাজিন। এসব ম্যাগাজিন কেবল কবি বা লেখক তৈরি করে না, পাঠকও তৈরি করে। ছয়ের

দশক হল লিটল ম্যাগাজিনের সুবর্ণযুগ। এরপর সাত, আট, নয় থেকে বর্তমান দশক পর্যন্ত শিল্প–সাহিত্যের নানা স্তরের রূপান্তর ঘটছে বিভিন্ন লিটল ম্যাগের হাত ধরেই।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা শহর, এমনকি ছোট ছোট গ্রাম থেকেও লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। নতুন সংযোজন ওয়েব ম্যাগাজিন। ধূপগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'প্রবাহ তিস্তা তোর্ষা' পত্রিকার ২০২১ সালের শারদ সংকলনে সম্পাদকীয় জানিয়েছে, অর্থাভাবে এবার শারদ সংখ্যা প্রকাশ না করার পরিকল্পনা ছিল। 'কিন্তু বাতাসে পুজোর গন্ধ ভেসে আসা শুরু হলে আর স্থির থাকতে পারি না।'

এই আবেগ থেকেই মূলত লিটল ম্যাগাজিনগুলোর শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। গতবছর বিশ্বব্যাপী অতিমারির প্রকোপে লিটল ম্যাগাজিনের জীবনও থমকে গিয়েছিল। এবছর আগের মতোই বইতে শুরু করেছে। চিরকালীন বাঙালি আবেগে, শোকজমা জলে পদ্ম–শালুক–পানাফুলের মতো ভেসে উঠল শারদ সংখ্যাগুলি। জেলায় জেলায় পত্রিকা প্রকাশের উন্মাদনা উৎসবের চেহারা নিল।

এরপর কী করে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের পাঠক কমে গিয়েছে। ইদানীং পুজো সংখ্যার মান নিয়ে হা–হুতাশও চলে। স্বর্ণযুগের সেই লেখকদের এক এক করে চলে যাওয়ার শূন্যতা যেন মিটছে না। মিটলেও সেই নামগুলি থেকে পাঠক বেরিয়ে আসতে চাইছেন না বা পারছেন না। আমার মনে হয়, লেখার গরিমা কমেনি, বরং লেখায় অভিনবত্ব এসেছে। কবিতার বাঁক বদল হয়েছে। এবছরের পত্রিকার প্রচ্ছদগুলি বেশ আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে, জীবনকে জানতে সাহিত্যের বিকল্প কিছু নেই। পুজোর দিনগুলিতে উৎসবের উপচার হয়ে, অবসর বিনোদনের অন্যতম পন্থা এইসব শারদ সাহিত্যপাঠ। ভ্রমণপিপাসু বাঙালির ট্রাভেল ব্যাগেও তাই জায়গা করে নেয় শারদ পত্রিকা। সবশেষে একথা বলাই যায়, বাণিজ্যিক ও লিটল ম্যাগাজিনগুলোর সারা বছর নিয়মিত সংখ্যা ও বিভিন্ন 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশ পেলেও মূলত শারদীয়া পত্রিকার হাত ধরেই বাংলার সাহিত্য–সংস্কৃতি অন্যমাত্রা পেয়ে থাকে। এই মাত্রাজ্ঞান বাঙালির একান্তভাবেই নিজস্ব।

(লেখক কবি, শিক্ষিকা)

আলোচিত

কংগ্রেসকে কীভাবে আরও ভাঙা যায়, মমতাকে হয়তো সেই পরামর্শই দেবেন প্রধানমন্ত্রী। বিএসএফ নিয়ে বিধানসভার আলোচনায় মমতা অংশ নেননি। মোদির সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলায় ওঁর সুবিধাই হল।

–অধীর চৌধুরী

আজ

দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলবর্তী ক্ষুদ্রতম দেশ সুরিনাম ১৯৭৫ সালের এই দিনে নেদারল্যান্ডস থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই দেশে একসময় চিনি উৎপাদনের জন্য ব্যাপকভাবে দাসপ্রথা চালু ছিল। পরে তা রদ হয়। স্বাধীন সুরিনামের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন ইউহান ফেরিয়ার।

বিন্দু বিসর্গ

রাস্তায় যা জ্যাম! গাড়ির জন্য পুরোনো হেলিকপ্টারের ব্লেড হবে? –অভি

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই তো মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া,না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। ইন্দ্রিয় সংযমের মতন কঠিন কাজ জগতে কিছুই নাই, এমন সহজ কাজও কিছু নাই। সুখলাভ যখন তোমার নিজের জন্য, ইন্দ্রিয় সংযম তখন অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি–সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়–সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় হইতেছে নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

–শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ৩০৭৮

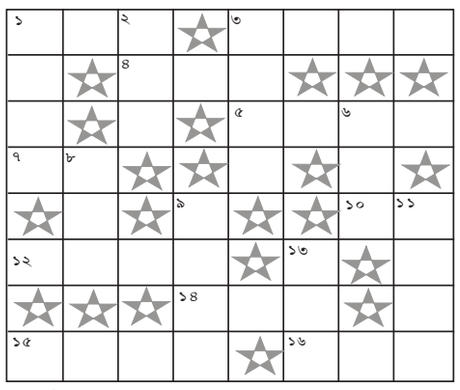

পাশাপাশি : ১। (কেলাস) গিরিতে শয়ন করেন যিনি, শিব, মহাদেব ৩। পাতাল ৪। ব্যবসায়ী, সওদাগর ৫। ছানা দিয়ে গোলাকার মণ্ড ভেজে বড়া করে চিনির রসে ডুবিয়ে তৈরি খাবার বিশেষ, বিস্ময়ে চোখের বিস্তার ৭। দেরিতে হয় এমন ১০। ধ্বংস, ক্ষতি, মৃত্যু, নিধন বা লোপ ১২। দাউদ খাঁর নাম অনুসারে উঁচুমানের সরু চালবিশেষ ১৪। মন্ত্রী ও তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত রাষ্ট্রীয় শাখাবিভাগ ১৫। দয়া আছে যাঁর, দয়াতে যাঁর চিত্ত পরিপূর্ণ, করুণাময় ভগবান ১৬। উগ্রগন্ধযুক্ত কন্দবিশেষ যা মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উপর–নীচ : ১। ২২ ক্যারেটের সোনা ২। ভারতের প্রাচীন জাতিবিশেষ, ব্যাধ, কিরাত ৩। নাকের একপাশে পরার গয়নাবিশেষ ৬। স্তব, স্তুতি বা প্রণাম ৮। ছাড়াছাড়ি, বিভেদ, আলাদা হওয়া, বিরহ ৯। বদল, পরিবর্তন, সমানমূল্যের বস্তুর পারস্পারিক আদান–প্রদান ১১। তান্ত্রিক সাধনার জন্য আসনরূপে ব্যবহৃত শব, চিত হয়ে শুয়ে শবের মতো নিস্পন্দ থাকা ১৩। পৌরাণিক জলজন্তুবিশেষ, গঙ্গাদেবীর বাহন।

সমাধান ■ ৩০৭৭

পাশাপাশি : ২। ভালোমন্দ ৫। তম্বুরা ৬। মনপসন্দ ৮। কানু ৯। ছকা ১১। মালাবদল ১৩। সাকিন ১৪। হলাহল।

উপর–নীচ : ১। কৃতদার ২। ভারা ৩। মনন ৪। আনন্দ ৬। মনু ৭। পঞ্জিকা ৮। কাবাব ৯। ছল ১০। অভিনব ১১। মান্ধাতা ১২। দহলা ১৩। সাল।

জনমত

ডিজিটালে বিপর্যস্ত শিক্ষা

সম্প্রতি ২০২১ সালের অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, অতিমারি পর্বে সারাদেশের মধ্যে বাংলা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলি ডিজিটাল শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শহরাঞ্চলের স্কুলে অনলাইন পাঠদান মোটামুটিভাবে চললেও প্রান্তিক অঞ্চলে তা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

সমীক্ষা অনুসারে দু'বছর পঠনপাঠন বন্ধ থাকলেও প্রাইভেট টিউশন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। নেট–নির্ভর অনলাইন শিক্ষা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ত্তের মধ্যে থাকলেও গ্রামাঞ্চলে তা অর্জন করা বিরাট সমস্যা। এই সমীক্ষায় ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্যের দিকটি প্রবলভাবে প্রকট হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষায় বাণিজ্যকরণের নীতি এই বৈষম্যকে আরও প্রকট করছে এবং অনলাইন শিক্ষায় উৎসাহ দিচ্ছে। সর্বোপরি স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ভারতে বিদ্যালয়, শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকের দেওয়া পাঠদানই শিক্ষার্থীর একমাত্র নির্ভরতার মাধ্যম, সমীক্ষা এমনটাই প্রমাণ করে। সেই কারণে কোচিং সেন্টারের এত বাড়বাড়ন্ত।

সর্বোপরি দু'বছর যাবৎ গৃহবন্দি শৈশবও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে, যা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বড় সমস্যা। শিক্ষায় বৈষম্য ও দুরবস্থা দূর করতে অবিলম্বে সরকারকে কোভিডবিধি মেনে ধাপে ধাপে প্রাথমিকস্তর থেকে বিদ্যালয়ে পাঠদান পর্ব শুরু করতে হবে। না হলে শিক্ষা ও সমাজ, দুই–ই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক
তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।

সারের কালোবাজারি

ইদানীং রাসায়নিক সারের দাম এতটাই বেড়েছে যে, কল্পনা করা যায় না। এমনিতেই কৃষকদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তার ওপর সারের দাম বাড়লে তাঁরা সমস্যায় পড়বেন। কৃষি ফসল বর্তমানে রাসায়নিক নির্ভর। আগে গোবর সার দিয়ে ফসল উৎপাদিত হত। কিন্তু বর্তমানে রাসায়নিক সার ছাড়া

ফসল ফলানো মুশকিল। জমির উর্বরতা এতটাই হ্রাস পেয়েছে যে, ভাবলে অবাক হতে হয়। সবুজ বিপ্লব–এর কথা মাথায় রেখে কৃষকদের দিকে নজর দিলে ভালো হয়।

দীপক বড়ুয়া, বড়ুয়াপাড়া, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি।

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের জয়

করোনা আবহে যখন বহু শ্রমিক সহ সাধারণ মানুষ কাজ হারিয়ে দিশাহারা, সেই সময় বিজেপি সরকার একের পর এক সরকারি পরিষেবা কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে সবরকম দায়ভার থেকে মুক্ত হতে চাইছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বিজেপি সরকার কৃষক স্বার্থবিরোধী তিনটি কৃষি বিল পার্লামেন্টে পাশ করিয়েছিল। আইন প্রয়োগের আগে সরকার কোনও কৃষক সংগঠন, কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ বা রাজ্য সরকারগুলোর সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনাও করেনি।

এই পরিস্থিতিতে ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর দিল্লিতে যে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা আজও চলছে। দিল্লির বিভিন্ন সীমান্তে কৃষকরা অবস্থানে বসেছেন। অবিলম্বে এই কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলেন কৃষকরা। কেন্দ্রীয় সরকার আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে যে কোনও মূল্যে গণতান্ত্রিক কৃষি আন্দোলনকে ভাঙার নানা চেষ্টা করেছে। কিন্তু আদতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে চলমান

এই আন্দোলনে ছাত্র–যুব–কৃষক–মহিলা–শ্রমিক সকলের ঐক্যবদ্ধ মিলিত লড়াই এই কৃষক আন্দোলনের জয়। অনেকেই মনে করেছিলেন আন্দোলন করে কিছু হয় না। কিন্তু কৃষকরা দেখালেন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, অদম্য মনোবল স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারকেও আইন পালটাতে বাধ্য করতে পারে। জনগণই শেষকথা বলে, কোনও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন নয়। দিল্লির কৃষক আন্দোলন শুধু ভারতের কৃষকদের নয়, বহির্বিশ্বেও গণ আন্দোলনে সংগ্রামরত বহু মানুষের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে। ভারতের ইতিহাসে এই কৃষক আন্দোলন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তবে আন্দোলনকারী কৃষকরা এখনই দিল্লির রাজপথ থেকে সরছেন না। কারণ কেন্দ্রের মোদি সরকার এখনও পার্লামেন্টে এই আইন বাতিল করেনি। প্রবল জনমতের চাপে উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাব নির্বাচন–পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর এই তাৎক্ষণিক ঘোষণা। তাই দিল্লিতে আন্দোলনরত সংগ্রামী কৃষকরা সম্পূর্ণ বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের পথ থেকে সরবেন না।

শ্যামল দত্ত
পূর্ব নেতাজিপল্লি, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।